নৃবিজ্ঞান ঃ উদারনৈতিক শিক্ষার ক্ষেত্রভূমি

ফারজানা ইসলাম*

নৃবিজ্ঞান সহ সবকটি সামাজিক বিজ্ঞানেরই মূল লক্ষ্য কোন না কোন ভাবে মানুষ ও তার সমাজকে বিশ্লেষণ। কিন্তু একমাত্র নৃবিজ্ঞানই একাধারে প্রাণীজগতের সদস্যরূপে মানুষ ও সংস্কৃতির বাহকরূপে মানুষকে বিশ্লেষণের দায়িত্ব নিয়েছে। তবে জৈব-সাংস্কৃতিক দিক এর আলোচনা বললেই যে প্রশ্নগুলো ওঠা স্বাভাবিক তা হলো—এ দুটো বলতে নৃবিজ্ঞানী কি বোঝান? অথবা কেমন করেই বা নৃবিজ্ঞান এই ব্যাপক গন্ডীতে নিজেকে ব্যাপৃত রাখে? বস্তুতঃ এ প্রসঙ্গে নৃবিজ্ঞান তার কর্মক্ষেত্রকে প্রধান দুটো ভাগে বিন্যস্ত করে নিয়েছে যার একদিকে আছে ভৌত নৃবিজ্ঞান যাতে প্রাণী হিসাবে মানুষের উৎপত্তি রহস্য, প্রাণী জগতে তার অবস্থান এবং সময়ের আবর্তে তার বিবর্তন ও বিভিন্নতার প্রতি আলোকপাত করে। দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে সামাজিক নৃবিজ্ঞান, সেখানে মানুষ কি করে প্রাণী জগতের সাধারণ বৈশিষ্ট্যের সাথে নিজের সাধ্য আরও একটি অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের সংযোজন করল অর্থাৎ কি করে সে সাংস্কৃতিক ক্ষমতার অধিকারী হলো (সংস্কৃতি বলতে সমগ্র জীবন ধারাকেই বোঝান হয়—যা অবশ্যই সামাজিকভাবে অর্জিত ও লালিত) তার সমাজ ব্যবস্থাকে রচনা করল, কত বিচিত্র ভাবে সে খাপ খাওয়ানোর প্রক্রিয়ায় অগ্রসর হতে হতে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভাষা, প্রতিষ্ঠান, উৎপাদন কর্মকান্ডের সৃষ্টি করল সে দিকেও দৃকপাত করেছে। সে জন্যই একই নৃবিজ্ঞান বিভাগে কর্মরত নৃতাত্ত্বিক ভাষাবিদ, অর্থনৈতিক নৃবিজ্ঞানী, শরীর পরিমাপবিদ, জীবাশ্মবিদ কিংবা আইন ধর্ম বিষয়ক নৃবিজ্ঞানী। এরা পরস্পরের সাথে ভাব বিনিময়ের মাধ্যমে দুটো সিদ্ধান্তে উপনীত হন—প্রথমতঃ প্রজাতিগত

* নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

ভাবে সব মানুষই একই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, সাংস্কৃতিগত ভাবে সে তুলনীয় এবং ব্যক্তিরূপে অনন্য। দ্বিতীয়ত এই ত্রিধারায় মানুষকে বিশ্লেষণ করলে 'পরিমাপ' এর চাইতে বিষয়ের অর্থোদ্ধার এর প্রতিই বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

কিন্তু নৃবিজ্ঞানীর মনেই যে কেবল মানুষ ও তার সংস্কৃতির অর্থোদ্ধারের তাগিদ আছে তা নয়-বরং মানুষকে জানতে চাইবার তাগিদ মানুষের মনে চিরন্তন, সে কারণেই প্রতিটি-ব্যক্তিই নিজস্ব ধারায় পর্যবেক্ষণ করে অন্য মানুষের আচরণের প্রকৃতি, হয়তোবা সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের সাথে যুক্ত করেও তা বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হয় সে, আর তা হলেই ব্যক্তির এই সামগ্রিক ধারনা হয়ে ওঠে গভীরতর অর্থে নৃবিজ্ঞান, যেমনি ভাবে গভীরতার দাবী রাখে রবীন্দ্রনাথের "মনস্তত্ত্ব" বা লালনের "দর্শন"। এরা কেউই আনুষ্ঠানিকতার ভিত্তিতে মনস্তাত্ত্বিক কিংবা দার্শনিক নন, কিন্তু এদের রচনায় যে প্রচ্ছন্ন মনস্তাত্ত্বিক ও দার্শনিক বিন্যাস রয়েছে তা লক্ষ্যণীয়। একই ভাবে ব্যক্তিগত "নৃবিজ্ঞান" অবশ্যই অনন্য।

কিন্তু মনে রাখা দরকার এই অনন্য অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে সামাজিক ভাবেই। কেননা এ অভিজ্ঞতা অবশ্যই তার পরিবার। শ্রেণী প্রজন্ম বা দলীয় সদস্যদের দ্বারা প্রভাবিত, একে অন্যের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে যেয়েই উপলব্ধিকৃত। সুতরাং ব্যক্তির নৃবিজ্ঞানে দলের নৃবিজ্ঞানের ছোয়াচ থাকাই স্বাভাবিক। তবে পেশাদার নৃবিজ্ঞানী ও ব্যক্তির অপেশাদার নৃবিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে একটি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে, তা হলো প্রতিটি মানব সমাজই প্রথম জনের চোখে মহান জাতির অংশ রূপে ধরা দিবে। 'অন্য সংস্কৃতি'কে উদারতা ও সহনশীলতার দৃষ্টিতে লক্ষ্য করবে, যার পরিণতিতে কোন জনগোষ্ঠীই আর অসভ্য, বর্বর থাকবে না। বা কোন সংস্কৃতিই অদ্ভুত, উদ্ভট মনে হবে না। এই উদার দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনের জন্য নৃবিজ্ঞানীকে গ্রহণ করতে হয়েছে বিশিষ্ট পর্যবেক্ষণ রীতি। এই পদ্ধতি দাবী করে পর্যবেক্ষকের প্রচন্ড আন্তরিকতা, যে আন্তরিকতায় তার পক্ষে সম্ভব হবে গবেষণার বিষয়ের মধ্যে নিজেকে একীভূত করে ফেলা। অর্থাৎ, তার পর্যবেক্ষিত সমাজ ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থাটিকে প্রচলিত অর্থে গবেষণাগারের পরীক্ষা-নিরীক্ষার আওতায় না এনেও তিনি যেন বিজ্ঞানীর গভীর অন্তর্দৃষ্টি লাভ করতে পারেন,

সত্যের কাছাকাছি যেতে পারেন, সঠিক অনুমান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন এবং প্রয়োজনে ভবিষ্যতের সম্ভাবনা ব্যক্ত করতে পারেন। সেই দক্ষতা অর্জন করাই হলো নৃবিজ্ঞানীর মূল লক্ষ্য।

পর্যবেক্ষণের এই ঐতিহ্য নৃবিজ্ঞানের জন্মলগ্নে ছিল না। সাম্রাজ্য-বাদ বিস্তার, পুঁজিবাদী অর্থনীতি, শিল্প বিপ্লবের মত ঘটনাগুলোই পরোক্ষভাবে এর সাথে জড়িত। কেননা ১৩শ ও ১৪শ শতকে সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারের পাশাপাশি প্রশাসক, পর্যটক, মিশনারীরা সংগ্রহ করতে থাকেন প্রচুর এথনোগ্রাফীক তথ্য। প্রবীন নৃবিজ্ঞানীগণ তাদের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষতঃ ঐসব তথ্যের উপরই নির্ভরশীল ছিলেন, এদের অনেকেই নিজ চোখে আদিম সমাজ দেখেনও নি (টায়লর, ফ্রেজার)। এসময়ই মর্গান, বোয়াস প্রমুখদের আহবানে এথনোগ্রাফীক তথ্য সংগ্রহ মূখ্য ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। ১৮৪০ এর দিকে পশ্চিম ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ নৃবিজ্ঞানকে পৃথক বিজ্ঞান হিসাবে ভাবা শুরু করেন। মজার ব্যাপার হলো সর্ব প্রথম গঠিত নৃবিজ্ঞান সমিতির সদস্যরা তখনও নানান মতে বিশ্বাসী হয়ে বিভিন্ন পদ্ধতিতে কাজ করতে থাকেন। কিন্তু একটি ক্ষেত্রে আশ্চর্যজনক ভাবে সবাই ছিলেন এক। তা হলো এতদিন পর্যন্ত যে অইউরোপীয়, অখৃষ্টান জনসমষ্টিকে বন্য, আদিম, নিরোধ বলে মনে করে অধ্যয়নের অযোগ্য ভাবা হতো, সেই সব "অন্য"দের প্রতি এরা প্রত্যেকেই আগ্রহী হয়ে ওঠেন। মনে রাখা দরকার এই আগ্রহ একেবারে স্বার্থশূন্য ছিল না। বরং দূর অতীতের প্রতিনিধিত্বকারী এসব 'জীবন্ত ফসিল' (living fossils) বা আদিম সমাজগুলো বিবর্তনবাদীদের ইতিহাস পুনঃগঠনের সহায়ক শক্তি-রূপেই বাড়তি কদর পেয়েছিল। কারণ এদের আদিমতার বিভিন্ন স্তরের নিদর্শন প্রকারান্তরে মানব প্রগতির বিভিন্ন পর্যায়কেই নির্দেশ করে বলে প্রথম দিককার নৃবিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করতেন, সেই সাথে আরও ধারণা করেছিলেন, প্রগতির শীর্ষে অবস্থান করছে খৃষ্টীয় ইউরোপের পুঁজি-বাদী সমাজ! প্রথম দিকের নৃবিজ্ঞানে স্বভাবতই যে দিকটি সুস্পষ্ট তা হলো, এটি কেবলমাত্র 'অনক্ষর' স্থবির আদিম সমাজ নিয়েই নিজেকে ব্যাপৃত রাখবে। প্রথম দিকের নৃবিজ্ঞানের আরও একটি বৈশিষ্ট্য হলো সমাজ পরিবর্তন বা প্রগতিকে একটি ব্যাপক ধারায় নিয়ে এসে ব্যাখ্যা করা বা বিবর্তনবাদী ধারণা তুলে ধরা। যেমন

মরগান, এঙ্গলস আদিম সমাজের বৈশিষ্ট্য হিসাবে যৌন অজাচারকে চিহ্নিত করেন। কিন্তু এখন সে সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করছেন নৃবিজ্ঞানীরা, তাদের সন্দেহের ভিত্তিতে রয়েছে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণাদি। তা ছাড়া আদিম যুগেও পৃথিবীর প্রাকৃতিক অবস্থা যেহেতু সর্বত্রই এক ছিল না। সুতরাং একই ধরনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন সর্বত্র গড়ে ওঠা যুক্তিসঙ্গত নয়। তাই আদিম শিকারী সংগ্রাহক সমাজ কোন অবস্থাতেই বর্তমানের দৃশ্যমান আদিম সমাজের হুবহু-রূপ হতে পারে না। সেই সাথে আরও মনে রাখা দরকার, একই জলবায়ুগত ও প্রাকৃতিক পরিবেশেও ভিন্ন ধর্মী জীবন যাপন রীতি থাকতে পারে। যেমন শীত থেকে রেহাই পেতে এস্কিমোরা সেখানে অত্যন্ত পরিমার্জিত কাপড় পরিধান করে, সেখানে প্যাটাগনীয় লোকেরা সারা শরীর অনাবৃত রেখে শুধুমাত্র কাঁধে এক টুকরো কাপড় ফেলে রাখে। সে জন্যই লীচ এর মত আধুনিক অনেক নৃবিজ্ঞানীই মনে করেন, আধুনিক এথনোগ্রাফী মানুষের বিভিন্নতা প্রকাশে যতটা না ব্যবহার করা যায় প্রাকইতিহাস নির্দেশের জন্য মোটেই ব্যবহার করা উচিত নয়। ফলে শুধুমাত্র আদিম সমাজ পাঠই নৃবিজ্ঞানের মহত্তম (!) দায়িত্ব হয়ে থাকতে পারেনা, বরং যেখানেই মানুষ ও তার সংস্কৃতি আছে, সেখানেই নৃবিজ্ঞানের প্রবেশাধিকার রয়েছে।

সমকালীন নৃবিজ্ঞানে প্রবীন নৃবিজ্ঞানের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা বদলে যাচ্ছে, সেটি 'রেস' বা 'নরগোষ্ঠী তত্ত্ব'কে কেন্দ্র করে। উনবিংশ শতকের শেষ পর্যন্ত নৃবিজ্ঞানের প্রধান দায়িত্ব ছিল, মানবজাতির উচ্চ নীচ পর্যায় নির্ধারণে দৈহিক মাপকাঠির প্রয়োগ করা। মূলতঃ বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক খনন থেকে পাওয়া ফসিল (fossil) ও অন্যান্য নিদর্শন এ সময় প্রাকৃতিক নৃবিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে কিন্তু মানবজাতিকে একই প্রজাতির অংশরূপে দেখবার ক্ষেত্রে প্রচ্ছায়ারও সৃষ্টি করে। তবে এই সময়েই এ, সি, হ্যান্স এর মত অনেক নৃবিজ্ঞানীই তদীয় অনুসারীদের উৎসাহ দেন গবেষণারত সমাজের ধর্ম, আচার প্রথা, জ্ঞাতি সম্পর্কে মনোনিবেশ করতে। তাতে ব্যাপক এথনোগ্রাফীক তথ্য সংগ্রহের কারণে "জাতিতত্ত্ব" বা 'এথনিক স্টাডিজ' (ethnic studies) নৃবিজ্ঞানে দ্রুত কেন্দ্রীয় আসন করতে দখল থাকে তা ছাড়া বৃটেনের নবীন নৃবিজ্ঞানীরাও এ সময় ইতিহাসের পুনঃ সৃষ্টিকেই একমাত্র লক্ষ্য মনে না করে তুলনামূলক সমাজ

তত্ত্বের তত্ত্ব সৃষ্টির দিকেই বেশী আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ১৮৯৩ এর পরে ডুর্খাইমের পথ ধরে এই সামাজিক নৃবিজ্ঞান শুরু হয়, পরবর্তীতে এতে ম্যাকস ওয়েবার ও মার্কসের যুক্তিশীলতা বিতর্কের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। ওয়েবারের প্রভাবে আজও পর্যন্ত অনেকেই ভাবেন— যাদু, জ্ঞাতিসম্পর্কের মত অপরিচিত প্রথাসমূহ মূলতঃ আদিম মানসিকতারই নামান্তর—যা অবশ্যই আদিম বা ঐতিহ্যবাহী সমাজের অর্থনৈতিক অযুক্তি কারণের সাথে কার্যকরীভাবে সম্পর্কিত। ফ্রেজার যেমন ভাবতেন যাদু বিশ্বাস বা রাজার ঐশ্বরিক পবিত্রতা যুক্তিশীলতার অভাবকেই নির্দেশ করে। অথচ পরবর্তীকালে ম্যালিনস্কির বা র‍্যাডক্লিফ ব্রাউনের কাজে প্রমাণ হয় বাইরে থেকে যা যুক্তিহীন মনে করেছিলেন পূর্বসূরীগণ, তা কত জটিল যুক্তিতে পূর্ণ, একটি মাত্র সাংস্কৃতিক উপাদানও কি দারুণ দক্ষতায় সমগ্র সমাজ কাঠামোর সাথে নিবিড় সম্পর্কে আবদ্ধ। বস্তুতঃ সমকালীন নৃবিজ্ঞানের বর্তমান ধারাটি সৃষ্টি হয়েছিল উপরোক্ত দুজনের কর্ম পথ অনুসরণ করেই, অর্থাৎ বৃহৎ সমাজ সম্পর্কে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ধারণার চাইতে ক্ষুদ্র সমাজের খুঁটিনাটি সকল তথ্য সংগ্রহ করে সমগ্রকের প্রেক্ষিতে অংশকে যাচাই করার প্রবণতা এই প্রথম আলোড়ন তোলে। এই পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টিভঙ্গিই মূলতঃ অতিঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ 'সমাজ বিজ্ঞান' থেকে নৃবিজ্ঞানকে পৃথক করেছে। বৃহৎ পরিসর থেকে নৃবিজ্ঞান সরে এসেছে ক্ষুদ্র সমাজে যা সমাজের বিশেষ কোন ক্ষুদ্রতর অংশে— যেমন আমেরিকান ইণ্ডিয়ানদের ভিতরে, শহরের বস্তিতে। গ্রামের দলীয় রাজনীতিতে, কিংবা নারী-পুরুষের লিঙ্গীয় বিভেদের গৃহপরিসরে। কিন্তু পন্থা একটাই, প্রচুর এথনোগ্রাফীক তথ্য সংগ্রহ করে এদের অন্তস্থিত রূপ প্রকাশ করা, এবং সংস্কৃতি সম্পর্কীয় বর্ণনামূলক (এথনোগ্রাফীক গবেষণা) তথ্যাদির উপর পর্যাপ্ত জ্ঞান রাখা। এই পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাবেই তৎকালীন নৃবিজ্ঞানীরা আফ্রিকা ও নিউগিনি এলাকার উপর প্রচুর মনোগ্রাফ তৈরী করেন। তবে যেহেতু সমাজকে একটি ক্রিয়াশীল সমগ্রক (functioning whole) রূপে চিহ্নিত করেছিলেন, সে জনাই তাদের লেখায় অতীত ছিল উপেক্ষিত, ফলে প্রচলিত সমাজ তাদের দৃষ্টিতে প্রায় স্থবির অপরিবর্তনীয় বা দ্বন্দ্ব মুক্ত সমাজ ব্যবস্থারূপেই ধরা দেয়। কিন্তু এই বিশিষ্ট নৃবিজ্ঞানী-

রাই মূলতঃ ফিল্ডওয়ার্কের পথ প্রশস্ত করেন—অন্য সংস্কৃতির বা তার গবেষণা এলাকার ভাষা রপ্ত করেন ও আচার আচরণে অভ্যস্ত হয়ে গবেষণাকে নব্য ধারায় এগিয়ে নিয়ে আসেন। মনে রাখা দরকার, এই মতবাদটিই দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে তুঙ্গে ছিল, তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরই একেও সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখা হয়। প্রথমতঃ এদের ইতিহাসবোধহীনতাকে আঘাত করা হয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ বিস্তারিত তথ্য প্রদানের মাধ্যমে এরা পক্ষান্তরে উপনিবেশিক শাসক-গোষ্ঠীকেই উপকৃত করেছে বলেও আক্রমণ করা হয়। বিশেষতঃ বৃটিশ ও দক্ষিণ আফ্রিকার নৃবিজ্ঞানীগণ—যারা বৃটিশ উপনিবেশিত আফ্রিকায় কাজ করেছিলেন—তাদেরকে তীব্রভাবে দায়ী করা হয়। কেননা সাম্রাজ্যবাদী প্রশাসন টিকিয়ে রাখার জন্য তারাই কুল কাঠামো ও রাজনীতির (lineage structure and politics) নমুনা দাঁড় করান এক্ষেত্রে সমালোচিত গবেষকদল অবশ্য বিজ্ঞানসুলভ ও বস্তুনিরপেক্ষ দৃষ্টির দোহাই দিয়েছিলেন, বলেছিলেন, এই বৈশিষ্টই নৃবিজ্ঞানকে মিশনারী ও প্রশাসকদের লেখা থেকে পৃথক করছে। অথচ অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, জানা সত্ত্বেও নৃবিজ্ঞানী তার পর্যবেক্ষিত সমাজের অধস্তন অবস্থার জনগোষ্ঠীর জন্য একটি উন্নতমানের ভবিষ্যত গড়বার পথ রুদ্ধ করে দেন, তদুপরি স্বসমাজের উন্নতাবস্থাকে স্থায়ী রাখবারই প্রয়াস নেন। এতে করে তার মূল্যবোধহীনতাই সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এতদসত্ত্বেও সমালোচনায় নামবার আগে আমাদের দুটি বিষয়ে দৃষ্টিপাত করা উচিত। প্রথমতঃ ১৯৩০ এর সময়ে যে প্রশাসক-দের অনুমতি ছাড়া গবেষণাস্থলে প্রবেশমাত্র করা সম্ভব ছিল না তাদেরকে সরাসরি আঘাত করে, এমন কোন তথ্য গবেষকের পক্ষে প্রকাশ করা দুঃসাহসিক ব্যাপার ছিল। দ্বিতীয়তঃ আজকের সমালোচনা-মনস্ক নৃবিজ্ঞানীও অনেকাংশেই এ জাতীয় সমালোচনার আওতায় পড়তে পারে। কারণ ফোর্ড ফাউণ্ডেশন, বহুজাতিক সংস্থা ইত্যাদির পরিচালনা কমিটির সদস্যদের পরিচালিত বিভিন্ন সংস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও গবেষণারত নৃবিজ্ঞানীরা অর্থদাতার মুখ চেয়েই গবেষণা কাজ এবং নকশাও করেনা। যার জন্য নয়া সাম্রাজ্যবাদ ক্রমশঃই ক্রিয়াশীল হতে পারছে। আমরা ইতিপূর্বেই জেনেছি, নৃবিজ্ঞানী

প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারীরূপে একটি সমাজে কিছুদিন কাজ করলে অনেক ভাবেই সেই জনগোষ্ঠী ও জীবনধারার ধরণ বুঝতে পারেন, এমনকি সেখানে কি বিভ্রান্তি ঘটছে—কি ভাবে তার সমাধান করা যায়, তা তিনি জানেন, অথচ কর্তৃপক্ষের কাছে সেভাবে জানালে প্রজেক্ট গৃহীত হবার ক্ষেত্রে সন্দেহ থাকে। সে কারণেই ব্যতিক্রমী দু'দশ জন ছাড়া অধিকাংশ নৃবিজ্ঞানীই সমঝোতায় আসতে বাধ্য হন। নৃবিজ্ঞানের ফলিত দিকটির গুরুত্ব দিনকে দিন যেমন বাড়ছে, তেমনি ব্যর্থতার প্রশ্নটিও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিচ্ছে। মানুষ ও তার সংস্কৃতিকে জানতে চাইবার মহত্তম উদ্যোগ যেহেতু নৃবিজ্ঞান গ্রহণ করেছে সে কারণেই ন্যায্যত আশা করা যেতে পারে জগতে বসবাস-কালে সেই মানুষ যখন সমস্যায় আবর্তিত হয় তখন তার সমাধান দেবার দায়িত্ব সে নেবে। অথচ দায়িত্ব নেবে কিনা এই প্রশ্নের জবাবে এক প্রান্তে আছেন রক্ষণশীল নৃবিজ্ঞানীরা (প্রধানতঃ পুরাতন নৃবিজ্ঞানীগণ) যারা চেয়েছিলেন বিষয়টি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পথ ধরে বস্তুনিরপেক্ষতার বৈশিষ্ট নিয়েই এগিয়ে যাক। অন্যদিকে রয়েছেন বিপ্লবী নৃবিজ্ঞানীগণ (বিশেষতঃ সমকালীন) যারা পঠিত জ্ঞানকে বাস্তবায়িত করবার জন্য, অধীত সমাজ সদস্যদের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য মূল্যবোধ নিরপেক্ষতা ত্যাগ করেছেন। তাদের মতে পরিস্থিতির প্রয়োজনে কখনও কখনও নৃবিজ্ঞানীর পক্ষে জড়িত না হয়ে থাকা সম্ভব নয়। তখন সচেতন ভাবেই শুধুমাত্র পর্যবেক্ষকের আসন ত্যাগ করে একজন কর্মীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয় তাকে। কারণ এ ধরনের নৃবিজ্ঞানী জানেন প্রশাসক বা শাসকগোষ্ঠী তার গবেষণা এলাকার জনগোষ্ঠীর ধ্যান ধারণা বা মূল্যবোধের অর্থদ্ধারে ব্যস্ত নয়, পক্ষান্তরে তিনি তার নৃতাত্ত্বিক দীক্ষার কারণেই খুঁটিয়ে দেখেন জনগণ কিভাবে তাদের সমস্যাটি দেখছে, ফলে তার পক্ষেই সম্ভব তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিভিন্ন পথ আবিষ্কারে তাদেরকে সাহায্য করা। এ ধরনের নৃবিজ্ঞানীরা মনে করেন, বিজ্ঞান ও মূল্য-বোধের ভারসাম্য রক্ষার নামে এই দায়িত্ব এড়ানো মানেই হলো, নিজ পর্যবেক্ষিত অধস্তন জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে বাধা দেওয়া এবং স্বসমাজের উন্নতাবস্থাকে টিকিয়ে রাখবার প্রয়াস নেওয়া। সুতরাং তিনি নিজ দায়িত্বেই স্থানীয় প্রভাবশালী চক্র—প্রশাসন যন্ত্র বা এমনকি

গবেষণার অর্থদানকারী সংস্থার বিরোধিতা করার উদ্যোগ নেন। তার এই উদ্যোগ নানান ভাবেই বাধাগ্রস্ত হয়, কেউ কেউ তখন এ থেকে সরে দাঁড়াতে চান তবে কারো অদম্য দুঃসাহসই আজকের নৃবিজ্ঞানকে নতুন একটি ধারায় এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এ জাতীয় গবেষণা পদক্ষেপ এর মধ্যে বিখ্যাত একটি হচ্ছে, পেরুর ভিকো'তে সম্পাদিত এ্যালেন হোমবার্গের এর কাজ। কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের এই গবেশক নিজে একটি প্ল্যানটেশান বাগান লিজ নিয়ে ভুমিদাস স্বরূপ ইন্ডিয়ানদেরকে স্বাধীনভাবে কাজ করবার সুযোগ দেন। সম্প্রদায়টি উল্লেখযোগ্য ভাবে সাড়া দেয়, এবং প্রমাণ করে স্বকীয়তা বজায় রাখবার সুযোগ দিলে সাংস্কৃতিক তথা রাজনৈতিক বর্জনের ভীতি কমে যায়। এই নিরীক্ষণ শুধুমাত্র ভিকোবাসীদের নয়—একই পরিস্থিতিতে বিরাজমান অন্যান্য সম্প্রদায় ও নীতি নির্ধারক শক্তিরও রুদ্ধ দৃষ্টির অপসারণ করে।

একই ভাবে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেকটি পরীক্ষণেও উত্তর আমেরিকান ইন্ডিয়ানদের সমস্যা সমাধানে যথার্থ সাহায্য দেয়া সম্ভব হয়। অর্থাৎ স্বকীয়তা ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে ভয় না দেখালে তারাও যে আধুনিকতার পথে আসায় আগ্রহী তা প্রমাণ করা সম্ভব হয়েছে। মূলতঃ নৃবিজ্ঞানীর বা যে কোন সমাজবিজ্ঞানীরই দায়িত্ব হচ্ছে কোন সমাজের অভ্যন্তরে যথাযথই যা ঘটছে তাকে জনসমক্ষে যতটা সম্ভব সুস্পষ্ট ও জোরালো ভাবে প্রকাশ করা; তা না করলে শেলটন ডেভিস বা টেরেন্স টারনারের মত নৃবিজ্ঞানীর কাছ থেকে আমাজনীয় ইন্ডিয়ানদের ও গিনি বিসাউয়ের বালেন্ডিদের নির্যাতন, হত্যা বা সাংস্কৃতিক স্বায়ত্বশাসন হারানোর ঘটনাগুলো জানা যেত না। ডেভিস তার বর্ণনায় ব্রাজিলের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় হাইওয়ে তৈরীর কারণে ইয়ানোমামো সম্প্রদায়ের ধ্বংশ সাধনের বিষয়টি তুলে ধরেন। এই "প্রগতির" জন্য ইয়ানো মামোরা দূর্ভোগ, অসুস্থতা, ও যন্ত্রণায় আবদ্ধ হয়। এরা আক্রমণকারীদের ভাষা প্রত্যাখ্যান করে। পরিণামে বুলডোজার দিয়ে তাদের বাগান উৎপাটিত করে দেয়া হয়। উপরন্ত তাদের টিকে থাকবার জন্য যে ডেমোগ্রাফ্রিক, পরিবেশগত ও বাঁচার প্রয়োজনীয় উপাদান ছিল, সব কিছু থেকেই বঞ্চিত করা হয়। প্রগতি ও স্বার্থের নামে এদেরকে হত্যার বলি করা হয়। এ

কারণেই অত্যন্ত সর্তকতার সাথে নৃবিজ্ঞানীকে তার দায়িত্ব পালন করতে হবে। কারণ ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতিকে হঠাৎ আক্রমণ করলে যে তার ফল উল্টো হয়—এ প্রমাণ যথেষ্ট আছে। আবার ঐতিহ্য-বাহী সংস্কৃতির পক্ষ থেকে নব্য ধারায় পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রত্যাখ্যান অনেক সময় সর্বনাশের ইঙ্গিত দেয়—যেমন বালান্তে সম্প্রদায়ে নারী ও যুবকরা প্রবীণদের দ্বারা অবদমিত ছিল ফলে উন্নয়ন বিমুখতাই হয়ে ওঠে বৈশিষ্ট্য তখন প্রচলিত ব্যবস্থায় ওলোট পালট হবার ভয় থাকলেও নৃবিজ্ঞানী স্থবির প্রবীণ সম্প্রদায়ের ক্ষতিকর রক্ষণশীলতাকে সঠিক বলতে পারেন না। তবে এ ধরনের সৎ গবেষণা সংখ্যার দিক থেকে খুবই কম ঘটেছে। আর যাওবা ঘটছে তার অধিকাংশই বিশ্ববিদ্যালয়ের বা যে কোন প্রাতিষ্ঠানিক বন্ধনমুক্ত গবেষকের দ্বারা সম্পাদিত হয়েছে। তাছাড়া এখনও বেশীর ভাগ নৃবিজ্ঞানীই ফলিত গবেষণা থেকে দূরে থেকে মৌলিক গবেষণায় নিজেকে ব্যাপৃত রাখতে চান।

নৃবিজ্ঞানের জ্ঞানকে সমকালে ফলিত ক্ষেত্রে প্রয়োগের যথেষ্ট চেষ্টা চলছে কিন্তু তাতে সফলতা প্রায় সীমিত হলেও এর দীক্ষা-প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রী, পণ্ডিত গবেষক সবার ভিতরেই প্রচণ্ড একটি পরি-বর্তনের পথ যে প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়েছে তা হলো উদারতা ও সহনশীলতা। "অন্য" মাত্রই 'ভিন্ন' কিন্তু 'নগণ্য' নয়—এ দৃষ্টি-ভঙ্গিই মূলতঃ মানবজাতির বিভিন্নতা ও সম্ভাবনা পাটার দুয়ার খুলে দিয়েছে। সেজন্যই Sol Tax এর মতই আমরাও বিশ্বাস করি।

আমরা যা শিখেছি ও শিখাতে চাচ্ছি – তা হলো আমাদের প্রজাতির সব জনগোষ্ঠীই একই রকম মানুষ। তাই যা কিছু 'মহান' ও মৌলিক তা সকলেই অর্জনের যোগ্য। আমরা জেনেছি যে, বহু অতীত থেকেই বিভিন্ন জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ধারার জীবন প্রবাহ ও মূল্যবোধ তৈরী করেছে। সুতরাং এই বিভিন্নতা ব্যক্তি এবং সম্প্রদায় উভয়ের জন্য অত্যন্ত মানবিক একটি বৈশিষ্ট্য। সেজন্যই সাংস্কৃতিক সহনশীলতাই মানবতা, কারণ প্রতিটি জনগোষ্ঠীই তার স্বকীয়তাকে গুরুত্ব দিয়ে থাকে, তাই যে কোন পরিবর্তন যা তার জন্য হুমকি স্বরূপ তাকে আপ্রাণ বাধা দিতে চেষ্টা করে। নৃবিজ্ঞানে দীক্ষিত ব্যক্তিকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে। অন্য সংস্কৃতির লোকেরা কি

চায় বা কি থেকে ভয় পায় তা 'অনুমান' না করে 'আবিষ্কারের প্রজ্ঞা অর্জনই তার দায়িত্ব. আর এই বিশ্বাসে উন্নয়ন ঘটলেই কেবল নৃবিজ্ঞান উদার শিক্ষার ক্ষেত্রভূমিটি তৈরীতে সাফল্য লাভ করবে। যা তাকে মানবতাবাদ ও বিজ্ঞানের সম্মিলিত পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

তথ্যপঞ্জী

১. Edmund Leach, *Social Anthropology*, Oxford University Press, New York. 1982, Ch. 1.

২. *David Pocock*, *Understanding Social Anthropology*, Teach Yourself Books, 1975.

৩. Louis A. Saas, *Ferment in Anthropology*, Harper's Magazine, May 1986.

৪. R.B. Taylor : *Introduction to Cultural Anthropology*, Allyn and Bacon, Boston, 1973. Ch. 1.

৫. Roger M. Keesing, *Cultural Anthropology : A Contemporary Perspective*. (2nd ed) HRW 1981, Ch. 1., Part v, and Ch 23.

৬. Talal Asad (ed), *Anthropology and the Colonial Encounter*, Ithaca Press, 1973.

৭. Jesse D. Jennings and E. Adamnson Hoebel, *Readings in Anthropology*,. McGraw Hill Book Co,. 1955.

৮. William A. Haviland, *Cultural Anthropology* (4th ed), Holt-Rinehart and Winston, 1975, Ch. 1.

৯. হেলালউদ্দিন খান আরেফীন এর "বাংলাদেশে নৃবিজ্ঞান চর্চার বিভ্রান্তি।" প্রকাশিত হয়েছে 'সমাজ নিরীক্ষণ' নং ২৪, মে ১৯৮৭। সম্পাদিত।